প্রেমের
গুঞ্জন

সম্পাদকের কথা

বর্ষা এসে গেছে।আধো ডোবাগুলোতে ব্যাঙেদের কলতান। আমাদের পৃথিবী টা নিশ্চয়ই আবার সুন্দর হবে। একদিন আসবে সত্যের ভোর। মুছে যাবে গ্লানি। অনাবিল আনন্দ নিয়ে শিশুরা জন্ম নেবে। বর্ণ, অর্থ বিদ্ধ করবে না কারো জীবন যাত্রা। আসবে স্বর্গীয় সঙ্গীত। সার্থক হবে প্রতিটি প্রানের বেঁচে থাকা। সবুজ হও পৃথিবী। তোমাকে যে খুব ভালো বাসি। বর্ষা ধুয়ে নিক তোমার বেদনা। তুমি হেসে ওঠো ঝর্নার মতো।

সম্পাদক

পাপড়ি দেব।।

দেখা

।।মানবেন্দ্র মজুমদার ।।

এবারে খুব ঝামেলা হল। কিছুতেই আসতে দেবে না। চারদিক একেবারে করাপশনে ভরে গিয়েছে। আগের লোককে পরে – পরের লোককে আগে পাঠান হচ্ছে। উৎকোচের বিনিময়ে। যে যেমন উৎকোচ দিচ্ছে তাকে সেরকম প্লেসমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে আমি অনেক প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু প্রতিবাদটা বড় জোলো ছিল - শক্তিশালী ছিল না। মানে আমার দলে খুব একটা বেশি কাউকে পাইনি। সবার মনোভাবটা এরকম যে – যা হচ্ছে হোক, কি আর করা যাবে ! অথচ আলোচনার সময় সবাই গলা চড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। হ্যানো করেঙ্গা ত্যানো করেঙ্গা বলেছিল। কিন্তু বাস্তবে আর তা হল না। ফলে ফল হল উল্টো। আমি টার্গেট হয়ে গেলাম। আমার টার্ম এলেই হাসিমুখে বিনয়ের সঙ্গে আমায় জানান হত – আমাদের সাথে থাকুন না আর ক'টা দিন, আপনি আমাদের অভিভাবকের মত, ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেন আমাদের। আপনি চলে গেলেতো আমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ব – যতদিন না আপনি আবার ফিরে আসছেন। - এইভাবে বারবার আমার যাওয়াটা কেঁচিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একদিন চীফের সাথে দেখা

করলাম। ও বাবা! ইনিতো আরো সরেস দেখি। যাবতীয় প্লেসমেন্টতো ওনার হাতেই হয়। আর উনি প্রায় প্রকাশ্যে উৎকোচ নিয়েই সে সব করেন। দেখি নানাজন নানাধরনের বড়বড় উৎকোচ নিয়ে নানানরকম বড়বড় সুপারিশ জানাচ্ছে । কেউ সালমানের ঘরে যাবে, কেউ ঋত্বিকের ঘরে যাবে, কেউ রনবীরের ঘরে যাবে। কিন্তু কেউ কোনো মেয়ের ঘরে যাবার আর্জি জানাচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার হল সবাই আর্জিগুলো পেশ করছে প্রায় প্রকাশ্যেই – বিশেষ একটা রাখঢাক নেই। একটু যা আছে তা হল রেললাইনের ধারে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করতে বসা মানুষ যেমন রেলগাড়ি দেখলে মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে লজ্জা নিবারণ করে – অনেকটা সেরকম । যাইহোক বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আমার ডাক এলো দেখা করার জন্য। আমি একটা আবেদন পত্র সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জানি – দেখা হলে যদি সবকিছু গুছিয়ে বলতে না পারি -তাই। ওনার সামনে যেতে না যেতেই উনি আমায় দেখে একেবারে 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'-হয়ে উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বেয়ারাকে ডেকে পানীয় আনার আদেশ দিলেন। তারপরে বললেন – আমি জানি আপনার সমস্যার কথা। কিন্তু আমি চাইনা আপনার মত এরকম একজন অভিভাবক এখনই চলে যান। আর তাছাড়া এখন জেনারেল কোটাতে যে ভ্যাকেন্সিগুলো আছে সেগুলো সেরকম ভাল কিছু একটা নয় যেখানে আপনাকে প্লেসমেন্ট করা যায়। আপনিতো জানেন যে আমাদের প্রশাসনের

অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। ইন্দ্রমহল থেকে প্রায় সবরকম অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। তাই একটু ভালো ভ্যাকান্সি হলেই আমরা সেটা রিজার্ভ কোটা করে বেচে দিচ্ছি নিলামের মাধ্যমে। তাতে বেশ দু'পয়সা আয় হচ্ছে প্রশাসনের। এসেনশিয়াল খরচগুলো মোটামুটি ভাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে তাতে। আপনাকে সবাই বলে যে আপনি বিরোধী পক্ষের। কিন্তু আমি জানি আপনি আমাদেরই পক্ষে। যিনি উপযাচক হয়ে ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেন তিনি কোনো সময় বিরোধী হতেই পারেন না। নিজের বলে না ভাবলে কেউ এ কাজ করে নাকি! যাক এবার বলুন আপনি কি সত্যি সত্যি যেতে চান ?

আমি বললাম – হ্যাঁ , চাই।

উনি অনেক খাতাপত্র ঘেঁটেঘুঁটে বললেন – বেশ, এবার আপনাকে আমি এক বিশেষ জায়গায় পাঠাচ্ছি। যেখানে আপনি স্বর্গ ও নরকের সহবস্থানটা দেখে আসতে পারবেন। আর যেহেতু আপনাকে প্লেসমেন্ট দিতে আমাদের চার স্বর্গীয়বর্ষ দেরি হল তাই আপনার মেয়াদের সাথে আমি আরো চার স্বর্গীয়বর্ষ যোগ করে দিলাম। অর্থাৎ নয় স্বর্গীয় বর্ষ। মর্ত্যের হিসাবে যা নব্বুই বছর। আপনি রাজি ?

সাময়িক ভাবে আমার জ্ঞানগম্মি লোপ পেল। মনে হল আমি আমার আন্দোলনে জয়ী হলাম এতদিনে। বলে দিলাম – রাজি।

ভূপতিত হলাম মর্ত্যে।

এক অতি সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসারে কন্যাসন্তান রূপে। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে দ্বিতীয় এবং বোনেদের মধ্যে বড়। বাড়ি-ঘর, সামান্য জমি-জায়গা এবং বাবার কর্মসূত্রে যা উপার্জন তা দিয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে কুড়ি জনের সংসার চলে যেত মোটামুটিভাবে। খুব একটা প্রাচুর্য না থাকলেও অভাবও খুব একটা ছিল না। ভালই চলছিল সব। কিন্তু বাধ সাধল নানারকম রাজনৈতিক টানাপড়েন। মাত্র বারো বছর বয়সে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হল অন্য জায়গায় – অন্য কোনোখানে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার পরে পড়াশুনোর পাট গেল উঠে। রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলার কাজ হল শুরু। উনিশ বছর বয়েসে বাবা দেখেশুনে এক উদ্বাস্তু ছেলের গলায় আমায় ঝুলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। তার চালচুলো কিছুই নেই – না আছে কোনো আত্মীয়স্বজন। একটা বেসরকারি কাজ করে। শুরু হল তারসাথে নতুন করে উদ্বাস্তুর জীবন নানান জায়গায় ভাড়াবাড়িতে। বিনোদন বলতে মাঝেসাঝে বাপেরবাড়ি যাওয়া। শ্বশুরবাড়ি কি জিনিষ জানলাম না কোনোদিন। ইতিমধ্যেই মা হলাম। আবার উদ্বাস্তু হয়ে চললাম পাহাড় জঙ্গলের দেশে – স্বামি সরকারি চাকরি পেয়েছে তাই। মাইনে অনেক কম – যৎসামান্য – কিন্তু নিরাপত্তা আছে – চাকরি চলে যাবার ভয় নেই। চূড়ান্ত অভাবের মাঝে শুরু হল দিন গুজরান। মা হলাম পাঁচ সন্তানের। তিন পুত্র দুই কন্যা। কোনোরকমে তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এদিকে সন্তানদের মুখে

দুবেলা ভাত তুলে দিতে গিয়ে আমাদের হিমসিম অবস্থা। অনাহার – ঠোঙা বানান – সেলাইফোড়াই করে চেষ্টা করতাম সংসারের গর্ত্তগুলো কিছুটা ভরাট করার। কিন্তু একটাই সান্ত্বনা ছিল যে প্রত্যেকটা সন্তান ছিল মেধাবী ও সৎ। দেখতে দেখতে বয়েস গড়িয়ে গেল। ছেলেরা চাকরি পেল , মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গেল। যে যার মত দাঁড়িয়ে গেল জীবনে। ছেলেরা বাড়ি বানাল নিজেদের মত করে আলাদা আলাদা। না – সেটা আমাদের নয়। সঞ্চয় কিছুই ছিলনা মানুষটার যা দিয়ে সে বাড়ি বানাতে পারে। মানুষটার অবসরের পরে এক ছেলে-বৌমার কাছে আশ্রয় পেলাম আমি আর মানুষটা। কিন্তু মানিয়ে নিতে পারলাম না। না – পেটে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার বিদ্যে নিয়ে অন্যের দোষ বিচার করার সামর্থ্য আমার নেই। সম্পূর্ণ দোষটা আমার ছিল। আমার আর ওই চালচুলোহীন লোকটার। ছেলে ছেলেরবৌ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। একদিন হঠাৎ করে লোকটাও গেল চলে। আমি আশ্রয় নিলাম মেয়ের কাছে। কেটেগেল আরো কিছুকাল। অশীতিপর বৃদ্ধা আমি। ছেলেরা নিতে চায়না কেউ। বাকযন্ত্রে দিলাম লাগাম পরিয়ে, চোখে বেঁধে নিলাম ঠুলি। কিন্তু মাঝেমাঝে সন্তানদের কাছে পাওয়ার লোভ হয় বড়। কিন্তু যার কাছেই যেতে চাই সেই ভাবে আবার এসে উপস্থিত হল এক মূর্তিমান গলগ্রহ।

আচ্ছা – মেয়েদের সারাটা জীবন কি উদ্বাস্তু হয়েই থাকতে হয় ? তাদের নিজের বলে কি কিছু থাকতে পারে না ?

অহেতুক মায়ার জালে জড়িয়ে সব হারাবার কোনো মানে হয় না। মায়ার বশবর্তী হয়ে শেষবার ছেলের বাড়ি থেকে ভদ্রভাবে গলাধাক্কা খেয়ে মেয়ের বাড়িতে ফিরে গেলাম। গলাধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এসেও কিন্তু অবসরে অতীত রোমন্থনে বসে ওদের কথাই ভাবতাম মমতা আর ভালবাসা মিশিয়ে। ওদের সন্তান যেন ওদের গলাধাক্কা না দেয়।

তারপরে চোখ বুঁজলাম।

অনেক কান্নাকাটি করল সবাই।

চীফের ঘরে দেখা করতে গেলাম আমি। যথারীতি উনি আমায় দেখে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন – দেখুন আমি ঠিক নয় স্বর্গীয়বর্ষ পরে আপনাকে ফিরিয়ে এনেছি। কিছু বলবেন ?

- আমি কেন গিয়েছিলাম ?

- নরক দর্শন করতে।

- নরক দর্শন ?

- হ্যাঁ – নরক দর্শন। এপারে নরক বলে কিছু নেই। যা আছে তা হল প্রতীক্ষা । ওপারেই সব রয়েছে। মানুষ মায়ায় পড়ে স্নেহ ও মোহের বশে প্রতিনিয়ত যে যন্ত্রণা ভোগ করে – সেটাই নরক যন্ত্রণা। তবুও এই অর্বাচীনের দল উৎকোচ দিয়ে সেই যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য আকুলি বিকুলি করে। তাকিয়ে দেখুন –

তাকিয়ে দেখি বহুজনে বহুবিধ উৎকোচ নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের মর্ত্যে যাওয়া ত্বরান্বিত করবার জন্য। ভাবলাম এরা কি নরক যন্ত্রণার কথা জানে না? নাকি অন্ধ স্নেহ আর মায়ার টান সেই যন্ত্রণাটাকে ওদের চোখের থেকে আড়াল করে রেখে দিয়েছে? নাকি কোনো সন্তানের এক লহমার ভালোবাসা যে স্বর্গীয় ভালোলাগা এনে দেয় তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় যাবতীয় নরক যন্ত্রণা? আর তার জন্যই কি বারবার ফিরে যাবার এত আকুতি?

উত্তরটা আজানা আমার।

।। নীলাদ্রীকা রায় ।।

।।বেদশ্রুতি পাল ।।

হাওড়া স্টেশন ও দরিয়াদৌলতের অবিনাশের শেষ দেখা

জাহাঙ্গীর হোসেন

:

চেন্নাই যেতে হাওড়া স্টেশনে ঢুকলাম "তৎকালে" টিকেট কাটতে। বিদেশী হিসেবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট দিতে হলো টিকেট কাউন্টারে। কাউন্টারের টিকেট বিক্রেতা আমার পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করলেন বেশ কিছুক্ষণ। বিশাল লাইনের অনেক মানুষ এমন সময় ক্ষেপণে বিরক্ত হলো কমবেশী সবাই। কেউবা চিৎকার করে বললো, "এতোক্ষণ কি ঘুমোচ্ছেন দাদা? খেজুরে আলাপ বাদ দেন"! কিন্তু টিকেট বিক্রেতা টিকেট দেয়ার কাঁচের ফোঁকড় দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েই রইলেন আমার দিকে পলক না ফেলে। মিনিট খানেক এভাবে থাকার পর বললেন - "দাদা, আপনার ডাক নাম কি মাতু"? "হ্যা" বলার পরই বললেন, আপনি কি দরিয়াদৌলত স্কুলে পড়তেন ১৯৪৭ সনে? মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" বলাতেই কাউন্টার ছেড়ে লোকটি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমায়। আমি বিস্মিত হয়ে কিছু বলার আগেই সে বললো "আমি অবিনাশ! তোর বাল্যবন্ধু আর ক্লাসমেট! চিনতে পারলি না আমায়"!

:

হ্যা, গাঁয়ের মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার "দরিয়াদৌলত" গ্রামে বসতি ছিল আমাদের। মা সখ করে আমার নাম রেখেছিল "মাতু" কিন্তু আমার দেড় বছর বয়সেই মারা যান মা আমাকে ছেড়ে! আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট দুটো নদী ছিল। পূব দিকের নদীটার নাম তিতাস, আর পশ্চিম দিকেরটার নাম ছিল ঢোলভাঙ্গা, যা গিয়ে মিশেছিল স্রোতঘন মেঘনার ঘোলাজলে। তখন গাঁয়ে অনেক হিন্দুর বসতি ছিল। অবিনাশ আর আমি গাঁয়ের ভাঙা বেড়ার দরিয়াদৌলত স্কুলে পড়তাম প্রাইমারিতে। ওর পুরো নাম ছিল "অম্বিকা চরণ দাস"! বাবার নাম স্মৃতি রঞ্জন দাস! কিন্তু আকস্মিক ১৯৪৭-সালের দেশভাগের সময় অবিনাশের পরিবার এক রাতে গ্রাম ছাড়লো আমাদের সবার অগোচরে। শুনেছি, যাওয়ার আগে গোপনে কোন মুসলমানের কাছে নাকি বাড়িসহ জমি বিক্রি করে গিয়েছিল ওর বাবা খুবই জলের দামে। আমার খেলার সাথী কৈশোরিক প্রেমজবন্ধু অবিনাশকে অনেকদিন খুঁজেছি আমি! কিন্তু কোথাও পাইনি ওর খোঁজ। সবাই বলতো, প্রাণের মায়ায় আর সুখদ্বীপের সন্ধানে ওরা ভারতে পালিয়ে গেছে।

:

বাংলাদেশের এক মুসলমান যাত্রীকে ব্যস্ত হাওড়ার টিকেট কাউন্টার ফেলে নিজ দায়িত্ব ভুলে, এমন আবেগঘন জড়িয়ে ধরার দিকে তাকিয়ে রইলো হাওড়া স্টেশনের হাজারো মানুষ।

আমার কৈশোরিক হারানো বন্ধুকে এভাবে পেয়ে বিদগ্ধ বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা পাঠে দুজনেই কাঁদতে থাকি, একে অপরকে জড়িয়ে। পাশে দাড়ানো আমার স্ত্রীর চোখও ভিজে ওঠে এ দৃশ্যে। লাইনে দাড়ানো সকল যাত্রীরা ভুলে যায় তাদের টিকেট কেনার কথা। কজন যাত্রী কাছে এসে মমতায় পিঠে হাত রাখে আমাদের! প্রিয়তর জীবনের ভজন সন্ন্যাসিনীর সুখ স্মৃতি আঁকড়ে ধরে কৈশোরির জীবনকাব্যের পাতা কুড়োনির আনন্দময়তার কথা বলে যাই দুজনে একে অন্যের বুকে বুক লাগিয়ে। অবিনাশ জানতে চায় আমাদের সেই গ্রাম, নদী, নৌকো, ধানক্ষেত আর মহিষ চাষীদের কথা। কিন্তু এতোদিনের জমে থাকা কষ্টবৃক্ষের শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনির উড়ে যাওয়া শব্দ ছাড়া কিছুই যেন বলতে পারিনা আমি হাওড়ার এ লাল ইটের প্রাগৈতিহাসিক স্টেশন ভবনে। অবিনাশ আবার বলে, এখনো আমার মনে আছে ভূমিহীন উদ্বাস্তু কিষাণ কালুমিয়ার রাত জেগে সারিন্দা বাজিয়ে জ্যৈষ্ঠ-বোশেখের জীবনঘন তৃপ্তির গান গাওয়ার কথা!

:

এসব ব্যথাতুর কাব্যিক জীবন ছান্দিকতায় হাওড়ার ঘন মানুষের মাঝে উত্তরাধুনিক ভালবাসার বৃষ্টিপাতে ভিজতে থাকি আমরা দুজনে অনেকক্ষণ! ভিজতে থাকে ওখানের হাজারো যাত্রী! মানবিক ভালবাসার পরাবাস্তব আষাঢ়ী বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কুয়োয় বসতি গড়া বর্ষাতি ব্যাঙের মত দুজনে হাতড়াতে থাকি সেই পুরনো মানবিক দিনগুলোর কথা! যা

বাউল কবি আব্দুল করিম বলে গেছেন তার সে দিনের কথা গানে। হাওড়ার অগণিত ক্লান্তিকর মানুষের ধূসর নীলিমায় দাড়িয়ে জল ঝরাই দুজনের শুকনো চোখ থেকে ক্রমাগত। তারপরো ফিরে আসি ওর হাতের ছোঁয়া ভরা ট্রেনের টিকেট নিয়ে, মারকুইজ স্ট্রিটের হোটেল কক্ষে!

:

ঢাকায় ফেরার পরও অনেকদিন যোগাযোগ ছিল অবিনাশের সাথে আমার। ও আসবে একবার ঢাকা আমার ফ্ল্যাটে। তারপর দুজনে একসাথে যাবো সেই "দরিয়াদৌলত" গাঁয়ে! যেখানে এখনো ঐ নামেই আছে আমাদের সেই স্কুল। একদিন চিঠি লিখেছিলো, একবার নিজ চোখে গ্রামের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার বাসনা! কিন্তু তারপর খবর এলো মারাত্মক "হার্ট এটাকে" আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিয়েছে অবিনাশ। সেই চিঠি পড়ে আমি কেঁদেছিলাম খুব! আমার কান্নার সাথে যোগ দিয়েছিল আমার তরুণি কন্যা শারমীনও। যে এখন আমেরিকার টেক্সাসে থাকে স্বামীর সাথে। শারমীন মোমেন বললে, কেউবা চিনতেও পারবেন আমার কন্যাকে! বয়সের ভারে ন্যূজ ক্লান্ত আমি! নাহলে আবার কলকাতা যেতাম অবিনাশের খোঁজে!

:

জানিনা বন্ধু অবিনাশ এখন বেঁচে আছে কিনা। এখনো আমি প্রাত্যহিক অগ্নিদগ্ধ পৌরাণিক পুস্তকের ভস্মিত ছাইয়ের মত উড়ে যাই সেইসব প্রেমজ বাতাসে, যে বুনো বাতাসে উড়ে

বেড়াতাম আমি, অবিনাশ আর আমরা সকলে। এসব সাদাকালো আর নীলাভ জীবন কোলাজ মনে করে হু-হু করে কেঁদে ওঠে মনটা। হারিয়ে যাওয়া স্কুল, মাঠ, নদী আর গাঁয়ের অবচেতনের কদম ফুলের ঘ্রাণের মাঝে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আবার অবিনাশকে নিয়ে। কিন্তু তা কেবল স্বাপ্নিক পলকহীন তাকিয়ে থাকা অলীক জলের শিহরণে যেন! মাতাল ঋতৃিক মধুময়তার সেসব পুরনো স্মৃতিদগ্ধ জীবনের আয়নায় আর মুখ দেখা হয়না আমাদের! অস্তিত্বের তন্তুজালে আটকে যায় যেন সেই পুরনো দিনের প্রেমজ রূপোলি ইলিশ! মহাজাগতিক যুক্তির অন্ত:সার শূন্যতার স্নিগ্ধতায় ভরা আমাদের সে দিনগুলো হারিয়ে ফেলেছি আমরা। যা হাওড়ার বিশাল প্লাটফর্মে খেলা করেছিল একদিন দুচারটে উঁচু প্রেমজ রোদবৃষ্টির মতো। কিন্তু তা আর মেলেনি পাখা দুবন্ধুর স্বর্গগামী সিঁড়ি বেয়ে হাওড়া থেকে বাংলাদেশের সেই প্রেমঘন "দরিয়াদৌলত"র লোকজ গাঁয়ে!

।। সঙকর্ষণ মজুমদার ।।

পাপড়ি

।।গোপা ঘোষ পালচৌধুরী ।।

শুরুতেই শেষের ইঙ্গিত ,
ঝরে পড়ে পাপড়ি ।
পাপড়ির বুকে অগণিত ইতিহাস
হাজার বছরের ।
ওরা মৃত্যুহীন
ওরা ইতিহাস ।
পাপড়িতে পাপড়িতে শাশ্বত ,
দিনের শেষেও অনিঃশেষ ।
পাপড়িগুলো ঝরে চলেছে
আজো
ঝরে চলেছে অনাদিকালের
স্রোতে .....

।। সৌম্যদীপ সেন ।।

।। শাশ্বতী মজুমদার ।।

শিশু টি

।। পাপড়ি দেব ।।

আমি সেই শিশুটি কে খুঁজছিলাম,যে হঠাৎ বলে উঠেছিল,"রাজা তোর কাপড় কোথায়?"

অনেক দিন ধরেই তাকে খুঁজে চলেছি

সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে

গতকাল দেখি স্মিত মুখে বাজারের থলি ভরে সে ধীর পায়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে

অমনি তার পিছু নিলাম

সে ঢুকে গেল এক কানা গলিতে

শেষ বাড়িটা তার। সযতনে নিকোনো, দরজা খুলেই ঘর। কোন উঠোন বা আর কিছু নয় শুধু রান্না করার এক ফালি বারান্দা আর দুটো ঘর।মা ছেলের সঙসার

আমাকে দেখে মা ছেলে চা খাওয়াবে বললো

বললাম চা হবে পরে আগে বলো কি করছো এখন?

জানো তোমায় কত খুঁজেছি!

নত মুখে ছেলে হাসে, বলে খুব ভালো আছি গো

আজকে এনেছি ইলিশ মাছ কচু দিয়ে মাছের মাথা খুব ভালো লাগে খেতে।

আমি মরিয়া হয়ে বললাম

তোমাকে কত দরকার জানো!

ছেলে হাসে, বলে আগামী বছর আমার বিয়ে। টুকটুকে বউ আসবে ঘরে।তার চোখে স্বপ্ন ঘোর।

আমি আবার বললাম, তুমি আর বলবেনা সত্য কথন?

মা, ছেলে নীরবে চেয়ে থাকে।

বলে,সত্য কথন কালে পেটে ভাত ছিল না, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, ছিল না শরীর ঢাকার বস্ত্র।

আজ সব আছে গো,সত্য ত্যাগের কল্যাণে।এর বেশি কিছু তো চাইনি আমরা।

সামনের মাসে এসে যাবে দুচাকার গাড়ি। আমাদের সুখে শান্তিতে থাকতে দাও।

আমি ধীর পায়ে জাগতিক সুখ ভরা ঘরটির দিকে তাকিয়ে চলে আসতে চাই।

ওরা বলে, বিয়েতে আসবেন। আমি লজ্জিত হয়ে চোখ নামাই , কি খুঁজতে এসেছিলাম ? তাই তো, কোনদিন তো ওদের কথা ভাবিনি।নিজেও হয়ে উঠিনি সেই শিশুর মতো। নিজের সুখের ঘরে বসে অন্যের কাছে সত্য কথন প্রত্যাশা করি।

থাক ওরা সুখে থাক

সত্যকে বলি দিয়ে আমরা যেমন সুখে আছি।

।। বেদশ্রুতি পাল ।।

।। শাশ্বতী মজুমদার ।।

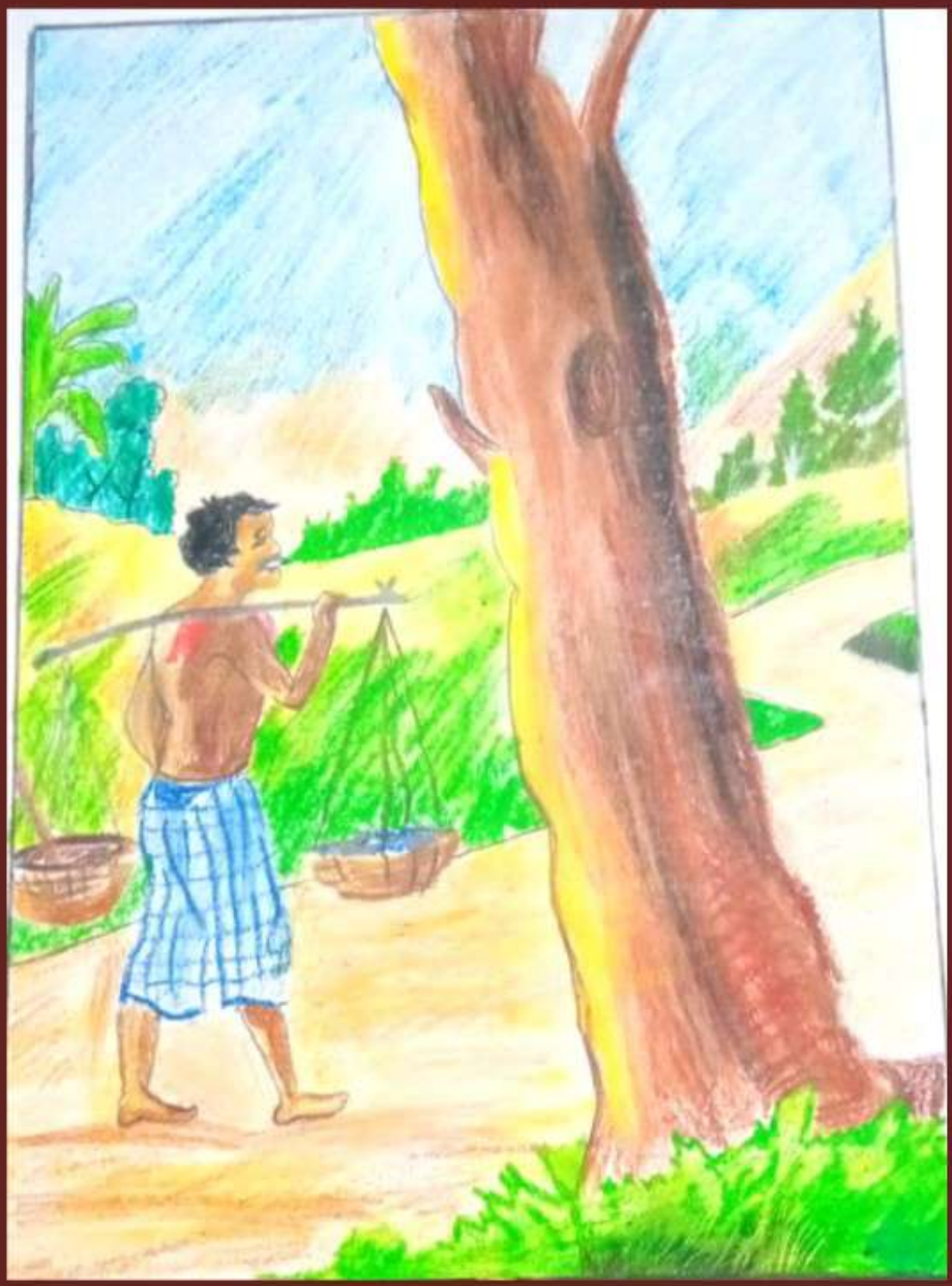

জলশহরের পাহাড় পুরে

।। অমিতাভ চক্রবর্তী ।।

পাহাড় পুরের পাহাড় ঘেরা গ্রামে
রোজ সকালে জলদ মেঘে
বৃষ্টি নামে
বাঁশের ঝোপে হিমেল হাওয়ায়
নাচন একটু থামে
বরফ গলা তিস্তা নদীর জলের ধারা
দিচ্ছে ধুয়ে ঢেউয়ের নাচন ফেনায় নুড়ি
ধুলোয় মাখা ঠান্ডা বাতাস রোজ নিয়ে যায়
পথের ধারে কুড়োয় যত আমের কুঁড়ি
পায়ে হাঁটার ছোট্ট সেই মেঠোপথে
রোজ উড়ে যায় ভাবনা চোখে রঙিন প্রজাপতি
বন্ধ্যা সমাজের অরাজকতার পেটের টানে
বদলে দিচ্ছে ভালো মন্দের চলার গতি
দিনের শেষে পাহাড় পুরে রাত্রি নামে

অপরাধী সে সময় জোৎস্না মাখে
উঁচু নিচু আসা যাওয়ার পথের বাঁকে
আটষট্টির স্রোতের বুকে বৃষ্টি আঁকে।

।। ঐশিক রায় ।।

।। নন্দিতা সাহা ।।

'ভালোবাসি'

– নীল অভিজিৎ

রক্ত ঝরানো কালো দিন বলো রাজনীতি ময়দান
ধর্মের আস্তা কুঁড়েই কিংবা ধ্বংসের চকিত টান
ঘুরে ঘুরে ফেরা যুদ্ধের শেষ পথে পথে দঙ্গলে
কেঁপে কেঁপে ওঠা অন্তর থেকে অন্তর জঙ্গলে
প্রশ্ন তবুও হেঁটে আসে মনে ভালবাসা, ভালবাসো?
শুধু আজ কেন করব প্রেম, প্রতিদিন ভালবেসো
বিশ্বের প্রেম দিশাহারা আজ এখানেই শেষ নয়
আর কতদূর এগবো আমরা ছেয়েছে নিরেট ভয়
আপনমুগ্ধ ঢলে হেটে যাক শহর হতে বন্দর
আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হোক একটাই উত্তর
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে নিশ্বাস বিশ্বাসে, ভালোবাসি
নিশ্বাসে নিশ্বাসে নিনাদ অনুনাদে, ভালোবাসি

শেষ কথা

একুশে জুন বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। একটি অনন্য দিন বলে মনে করি।আজ চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আগামী সংখ্যা মহালয়ার দিন প্রকাশ করা হবে।

ধন্যবাদ সবাইকে যারা শত কাজের মাঝে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন ভ্রমরের গুঞ্জনকে।

গোপা ঘোষ পালচৌধুরী চলে গেলেন অজানার দেশে। আমাদের কাছে শেষ কবিতা দিয়েছিলেন কিন্তু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য পিডিএফ টা দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁম শান্তি।

।। ধন্যবাদ ।।